গণনাট্য আন্দোলনের শরিক বিজন ভট্টাচার্য

দেবরূপা দাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বাংলা তথা ভারতের মাটিতেও সংঘটিত হয়েছিল সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নব বিপ্লব। চল্লিশের উত্তাল দশক—আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির অস্থির অবস্থায় মার্কসীয় মতাদর্শে দীক্ষিত একদল তরুণ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীরা ফ্যাসিস্ট ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা প্রসারের লক্ষ্যে এক ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলে। বিশ্বযুদ্ধের চেহারাটাই পাল্টে যায় হিটলারের রাশিয়া আক্রমণে। ফ্যাসিবাদের বর্বরতায় সাহিত্য-সংস্কৃতিও তখন বিপন্ন। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিকে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বোধোদয়ের কালাকাল বলা যেতে পারে।.....একটি গণতান্ত্রিক জীবনবোধ ন্যাশনাল সোশ্যালিজম বা ফ্যাসিস্টতন্ত্রের সঙ্গে পরোক্ষভাবে মোকাবিলা করতে গিয়ে অনুন্নত এই উপনিবেশেও মূর্ত হয়ে উঠল নবজীবনের সজীবতায়। ....বাতববাদী হলেও আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি—উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন।" ('গণনাট্য আন্দোলনের একাল ও সেকাল' : বিজন ভট্টাচার্য, শারদীয় কালান্তর, ১৩৭৪) শিল্প ও সংস্কৃতিতে বর্তমানের ছায়া আনতে গড়ে ওঠে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সভাপতি সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এর ইতিহাস আরও দীর্ঘ। ১৯৪১-এর ২২শে আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক পদ ছেড়ে আসা সাংবাধিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো 'রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাপ্তাহিক' 'অরণি'—লক্ষ্য হল ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার ও সমাজতন্ত্রের ধারণায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকার। বিজন ভট্টাচার্যও এই সময় আনন্দবাজার পত্রিকার কাজ ছেড়ে তার বড়মামার এই পত্রিকাটিতে লেখা শুরু করলেন 'সহযাত্রী' নামে। "গণনাট্য সঙ্ঘের কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির কথা স্বতই এসে পড়ে। কেননা

রাজনীতি বিবর্জিত শিল্পকর্মের কতা, কী সঙ্গীতে কী নাট্যচিন্তায়, ভাবনায় অন্তত গণনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা যায় না। তাই বলে নিছক রাজনীতি প্রভাবিত কোন শিল্পকর্মই কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে ওতরাবে না। ইমোশন ও ভাবরাজ্যে যার আনাগোনা, সেখানে সবসময়ে লাঠিবাজি চলে না। মুষ্টিবদ্ধ আস্ফালন অনেক সময়েই জোলো বলে মনে হয়। আবেদন নিবেদন সাধারণ মানুষের অন্তরে পৌঁছয় না। প্রগতিশীল শিল্পকর্মে এই 'টাইটরোপ ওয়াকিং' শিল্পীকে জনসাধারণের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে বহু আয়াসে আয়ত্ত করতে হয়। এই সজ্ঞানবোধের অন্য কোন, 'শর্ট কাট' নেই। জনসাধারণের সঙ্গে থেকে তাদের চোখ দিয়ে দেখা, আবার শিল্পসৃষ্টির সময়ে জনসাধারণের বাইরে এসে শিল্পীর চোখে দেখা, যুগপৎ এই দর্শন প্রকরণের ভেতর দিয়েই সত্য নিরূপণ করা সম্ভব।" ('গণনাট্য আন্দোলনের একাল ও সেকাল' : বিজন ভট্টাচার্য, শারদীয় কালান্তর, ১৩৭৪) সমাজ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব নিয়ে লেখক ও শিল্পীগণ 'প্রাণের রসদ' যোগাবার কাজে নিমগ্ন হয়। রাজনীতিকের চাইতেও শিল্পীর দায়িত্ব সমধিক। মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গণনাট্যের মূলকথা।

এর আগে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'অগ্রণী'তেও লিখছিলেন। এরই মধ্যে ঘটে যায় '৪২-এর আগস্ট, যুদ্ধে খাদ্যের যোগান স্বাভাবিক রাখতে গ্রামবাংলা লুঠ হয়ে যাওয়া, সঙ্গে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। একই সময়ে ঢাকায় নিহত হলেন কমিউনিস্ট কর্মী ও প্রতিভাবান লেখক সোমেন চন্দ। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে গণচেতনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, নাটক, পথনাটিকা, পোস্টারের মতো সাংস্কৃতিক মাধ্যমকে ব্যবহার করা হল। 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট'র উদ্যোগে সুবোধ ঘোষের গল্প 'ফসিল'-এর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কৃত 'নাট্যরূপ 'অঞ্জনগড়', তার মৌলিক নাটক 'কেরানী' ইত্যাদি অইভনয়ের সঙ্গেই এক গণচেতনা জাগরিত হতে শুরু করলো। সমকালীন গভীর অস্থিরতা, ব্রিটিশের সুশাসনের অভাব, বিশ্বজোড়া ত্রাস ও গ্রামবাংলার ভগ্ন অর্থনীতি, তীব্র খাদ্য সংকট—সামগ্রিক ভাবে জন্ম দেয় বিশেষ কিছু প্রবন্ধাবলী, নাটক, গল্প। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জি ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাটক লেখার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ১৩৫০-এর সেই ভয়াবহ মন্বন্তরের দিনে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে যে লেখক গোষ্ঠী অগ্রবর্তী হলেন তাঁরাই ১৯৪৩-এর ২৫শে মে বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। প্রথম অধিবেশনেই যে সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছিল তা হল একটি 'People's theatre movement' গোটা ভারত জুড়ে গঠন করা হবে যার উদ্দেশ্য হবে 'People's struggle for freedom, cultural progress and economic justice.'

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের বিজন ভট্টাচার্য কলকাতায় এসেও গ্রামীণ সংস্কৃতির সংস্পর্শেই তৃপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতে গ্রামীণ সংস্কৃতিই বাংলাদেশের সংস্কৃতি। এরই সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল কৃষিভিত্তিক বাংলার বৈপ্লবিক সংস্কার কিছু না হলে দেশের দশেরও কোন মঙ্গল হবে না। সামগ্রিকভাবে মানুষের যন্ত্রণা, অধিকার না পাওয়ার কষ্ট, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় কোণঠাসা হয়ে পড়ার বীভৎসতা তিনি খুব সামনে থেকে লক্ষ করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজেও বিভিন্ন সময় মতাদর্শগত কারণে কর্মস্থানের বদলও ঘটিয়েছে। '৩৯ সালে টিবি রোগাক্রান্ত হয়েও বছরখানেক হাসপাতালে কাটান। সেখানেও তিনি 'চিকিৎসা সঙ্কট' ও 'বিরিঞ্চিবাবা' অভিনয় করেন। বস্তুত যেকোন বিষয়কেই একটা 'Scientific attitude'এ দেখার অভ্যাস ছিল তাঁর। পূর্ববঙ্গেও যেমন, পশ্চিমবঙ্গেও তেমনি গ্রামের মানুষের মধ্যে গিয়ে তাদের সমস্যার উৎসগুলি, তাদের জীবনজীবিকার বৈচিত্র্য ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এরই সঙ্গে তৎকালীন বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিও তিনি ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। আর এই অভিজ্ঞতাগুলিকেই লেখ্যরূপ দিতে গিয়ে তাঁর প্রাথমিক ভাবনা ছিল Formর রীতি নিয়ে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানাচ্ছেন, "Form হিসাবে মোটামুটি একটা বুঝতে পারতাম, how to reach these agony, this challenge of the people, people -এরই জিনিস peopleএর কাছে পৌঁছে দেব।" কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, '৪২-এর সাইক্লোন, ১৩৫০-এর ভয়াবহ মন্বন্তরের পরে কলকাতার পার্কে এখানে-সেখানে লঙ্গরখানায় ঘুরে মানবদরদী এই মানুষটির মনে হয়েছিল, "I became sorry to see that the art form was not strong enough to convey the depth of their sufferings, their tragedy, their crisis." এই ভাবতে ভাবতেই মনে হল, ওরাই যদি ওদের কথা বলতে আরম্ভ করে 'right on the stage, appear themslves.' এই ভাবনা থেকেই বেরিয়ে এলো প্রথম একাঙ্ক 'আগুন'—'অরণি' পত্রিকায় ২৩শে এপ্রিল ১৯৪৩-এ প্রকাশ। প্রথম অভিনয় 'নাট্যভারতী'-তে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা হল), মে ১৯৪৩, প্রযোজনা : ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। শম্ভু মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "যখন ভাষা কী, সংস্কৃতি কী, ফর্ম কী, কন্টেন্ট কী ইত্যাদি নানা কথা নিয়ে অজস্র মাথা খুঁড়ছি আমরা, তখন বিজনের নাটক 'আগুন প্রথম পদক্ষেপ।' গণনাট্য ধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

অনুযায়ী এখানেও ৫ম দৃশ্যে সিভিক গার্ডের আচরণের প্রতিবাদে লাইনে দাঁড়ানো কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ঐক্যবদ্ধ হয়। বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষেরক রাজধানী কলকাতার ধ্বস্ত, আদর্শচ্যুত, ক্ষয়িত এবং সর্বোপরি অস্থির রূপ চিত্রিত হয়েছে। জলের জন্য লাইন, চালের জন্য লাইন—এই কিউয়িং কলকাতা আগে দেখেনি। 'আগুন'-এর দৃশ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েও সংহত ঐক্য নির্দেশে সফল। এক্ষেত্রে বিষয়ই যেন নিজে Form হয়ে উঠেছে।

'আগুন'-এর পর বিজন ভট্টাচার্য রচিত পরবর্তী একাঙ্ক 'জবানবন্দী'। প্রথম প্রকাশ ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৩, 'অরণি'র পাতায়। আর প্রথম অভিনয় 'স্টার' এ ৩রা জানুয়ারি ১৯৪৪। 'জবানবন্দী'র কাহিনী দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার গ্রামের চিত্র। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রণোদনায় নেমিচাঁদ জৈন 'অন্তিম অভিলাষ' নাম দিয়ে নাটকটির হিন্দি অনুবাদ করে 'হংস' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 'জবানবন্দী'র অভিনয় দেখে গোপাল হালদারের দাদা রঙ্গীন হালদার লিখেছিলেন, 'বাংলা নাট্যকলার নতুন সূচনা।' চারটি দৃশ্য সমন্বিত এই একাঙ্কের ১ম দৃশ্যে গ্রামের চাষী শুধুমাত্র ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য পরিবারসহ শহরে এসে পড়ে এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত ও রিক্ত হয়। মাঠের রাজা পরাণ মণ্ডল দুচোখে সোনা ধানের স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার রাস্তায় 'হুমড়ি খেয়ে মরে।' সম্পূর্ণত সমসাময়িক কৃষক পরিবারের অসহায়তা ও যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে এই একাঙ্কে।

এর পরেই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় অভিনীত হয় 'নবান্ন' নাটক। 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'নবান্ন'। প্রথম অভিনয় 'শ্রীরঙ্গম'এ ১৯৪৪-এর ২৪শে আগস্ট। বিজন ভট্টাচার্য চল্লিশের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির ভাষারূপ দিতে সম্ভবত কুণ্ঠিত ছিলেন, সেই কারণেই তাঁর নাটকে সেই সব অমানবিক, অসহায় পরিস্থিতিতে পড়া মানুষগুলি নিজেদের কথা নিজেরাই বলেছে। আর ঠিক সেই কারণেই নাটকটি এতো জীয়ন্ত। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা। প্রচলিত নাট্যধারার ফর্ম ভেঙ্গে বিষয়কে বাস্তবের রূঢ় মাটিতে নামিয়ে এনে বিজন ভট্টাচার্য প্রস্তুত করলেন সমসাময়িক সামাজিক দলিল। 'প্রমা' প্রকাশনীর 'নবান্ন'র ভূমিকায় নাটসমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হিসাবে নতুন জীবনদর্শনের অভিব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটি দৃশ্য পরস্পর পৃথক। হিরণকুমার সান্যাল মন্তব্য করেছিলেন, নাটক হিসেবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি

লক্ষণীয়। তবে তাঁর মতে নাটকের যাবতীয় ত্রুটি অভিনয়গুণেই ঢাকা পড়ে যায় ('পরিচয়', ১৩৫১, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা)। 'নবান্ন' উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকাতেও দর্শক-পাঠককে জানানো হয়েছিল এই ধরনের নাটকের উদ্দেশ্য—সমাজব্যবস্থার অসমতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে জর্জরিত বিষিয়ে ওঠা মানুষের মন এই নতুন ধরনের নাটকের মধ্যে দিয়ে আরও শক্তিশালী ও প্রতিরোধী হয়ে উঠছে।

নাটকের অঙ্ক বিভাজনেও প্রথা ভাঙ্গার ইঙ্গিত। পূর্ণাঙ্গ নাটক অথচ চারটি অঙ্ক—দৃশ্য বিভাজনও অসম। ১ম অঙ্ক আমিনপুর গ্রামের পটভূমিকায় বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে পুলিশী সন্ত্রাসের ছবি। একই সঙ্গে আকস্মিক বন্যায় বিধ্বস্ত হয় আমিনপুর। সঙ্গে গ্রাম্য মহাজন, জোতদারের স্বার্থান্বেষী আচরণ। অনাহারে বিধ্বস্ত একটি সম্পন্ন চাষী পরিবার আশ্রয় নেয় কলকাতার রাস্তায়, পার্কে। নাট্যকার এরই পাশে ধনী গৃহস্থের বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠান, মানুষের দুর্ভাগ্যের ছবি তোলা নিয়ে বাণিজ্যিক শিল্পের পসরা গোছাতে এগিয়ে আসা শহুরে ফটোগ্রাফার, এরই পাশে নারীপাচার চক্রের আড়কাঠিদের দৌরাত্ম্যের চিত্র। শহরের লঙ্গরখানায় বেদনার্ত পরিবেশের দৃশ্য। তবুও শেষে কোনপ্রকার হতাশা বা নিরন্নতার মধ্যে নাটক শেষ হলো না। নাট্যসমালোচক ড. অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্য—"কিন্তু কোনো সামন্ততান্ত্রিকতত্ত্বে দীক্ষিত নাটকের পরিণতি এরূপ হতে পারে না।" চুরাশি বছর আগের 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষাদময় পরিণতি দর্শক পাঠকের অন্তরে এক নিত্যকালের প্রতিবাদ জাগিয়ে রাখে। আর অন্যদিকে 'নবান্ন'র অতর্কিত সুখময় পরিণতিতে ভাবনা ও বেদনা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়। চিত্তের কোনো উত্তেজিত সংকল্প জাগে না। তবুও আধুনিক গণনাট্যের প্রবর্তনা এ নাটক থেকেই—এর ঐতিহাসিক মূল্যই বেশি। গ্রামে ফেরার তাগিদ, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ, সর্বোপরি নবান্ন উৎসবের ইঙ্গিত—মিলিতভাবে তুলে ধরলো গণনাট্য আন্দোলনের শরিক নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে। 'নবান্ন' অর্থ শুধুমাত্র নতুন ফসলের উৎসবমাত্রই নয়। প্রচণ্ড খিদে আর অত্যাচারের কঠিন মাটিতে যে নতুন ধ্যানধারণার জন্ম হল, তা-ও তো একঅর্থে নবান্ন! 'নবান্ন' নাটকের বিজ্ঞাপনপত্রে ছিল, নবান্ন প্রযোজনায় যে নামটি ছিল তা হলো 'ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘ (ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাট্যবিভাগ)'। গোটা দেশে এই IPTA এর কার্যকলাপের পাশে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিবিম্বিত করতে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। শিশির কুমার ভাদুড়ীর যুগের নাটকে একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে যে নতুন ভাবনার বীজ বপন করা হলো বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম। সমকালীন

পরাধীন ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতামুখী মুমূর্ষু পটভূমিকায় ঐক্যবদ্ধ, সংগ্রামী, নবজাগরণের প্রতিষেধকের ইঙ্গিতদানই এই নাট্যকর্মের উদ্দেশ্য।

'অবরোধ' নাটকটি গণনাট্য সঙ্ঘ অবস্থান পর্বেই লিখেছেন। দীর্ঘ ছয়টি অঙ্কে মালিক পক্ষের অন্তর্লীন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, নির্বিচার শ্রমিক শোষণ এবং প্রতিবাদী শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়াস—২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতার নতুন সমস্যাই আলোচ্য নাটকের পৃষ্ঠপট। তবে 'নবান্ন' থেকে শুরু করে 'গর্ভবতী জননী' পর্যন্ত তিনি যে একই ধারা অনুসরণ করেছেন, তা নয়। এক সাক্ষাৎকারে নাট্যকার জানাচ্ছেন, "একটা কথা আমি জানিয়ে রাখি যে এই নাট্য রচনার ক্ষেত্রে কখনও সেই নবান্ন-র ধারা আমাকে ধরেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমিও সেই ধারাকে ধারণ করেই নতুন খাতে নদ-নদীর মতো দিক পরিবর্তন করার প্রয়াস পেয়েছি।" (বহুরূপী ৩৩, অক্টোবর ১৯৬৯) গণনাট্য সঙ্ঘের শরিক এক নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা হিসাবে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে আঞ্চলিক ভাষা, ছড়া গান, পালাপার্বণ, উৎসব, মোরগের লড়াই, গোরুদৌড়, লাঠিখেলার পাশাপাশি গ্রামীণ সভ্যতার বিকৃত ও কুরুচিকর দিকটিও যেমন লোভী ও শোষক মানুষ জোতদার, মহাজন আবার শহুরে দালাল চক্র, ঠিকাদার, কুচক্রী শ্রেণীও উঠে এসেছে। বাস্তবিক ভাবে 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'—এই তিনটি নাটকই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলনের তীব্রতম মুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গত দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে পার্টির চালিকা শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণনাট্য আন্দোলনের গতিও স্তিমিত হয়ে আসে। বিজন ভট্টাচার্যেরও পার্টির সঙ্গে একটা ideological clash হয়, নাটকের দল নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি যাওয়ার প্রস্তাবে। একটি সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন, "কিন্তু পার্টির consent চাই। আট নম্বর ডেকার্স লেনে সভা বসে, সেখানে I was chaterised, আমি একটা squad নিয়ে নোয়াখালি যেতে চেয়েছিলাম। এই প্রত্যাখ্যানে একটা সাংঘাতিক মানসিক অবস্থা হয়। spiritually and psychologically I was outraged চার পাঁচ মাস সব কিছু থেকে সরে রইলাম।" ১৯৪৮এ পার্টি বেআইনি ঘোষিত হল। ভারতীয় গণনাট্য যে উদ্দেশ্য ও যে ব্রতে নিয়োজিত ছিল—একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অঙ্গীভূত হওয়ার কারণে জনসাধারণও এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করে। বিজন ভট্টাচার্যও এর পর ক্যালকাটা থিয়েটারে ও পরে নিজের নাট্যদল কবচকুণ্ডলের জন্য নাটক রচনা করতে থাকেন। মৃত্তিকা সংলগ্ন এই মানুষটির পরবর্তী নাটকগুলিতেও মাটির মানুষেরই গন্ধ। IPTAএ থাকাকালীনই দেশভাগের আশঙ্কায় লিখেছিলেন 'জীয়নকন্যা', ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে লেখেন 'গোত্রান্তর'; 'কলঙ্ক' ও

'দেবীগর্জন'-এও শেষে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ—'কলঙ্ক' (১৯৫৯)য় অত্যাচারী বিদেশী সৈন্যের বিরুদ্ধে আর 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬) এ দেশি শোষক প্রভঞ্জনের বিরুদ্ধে। সঙ্ঘ ত্যাগ করলেও শিল্পীসত্তা ত্যাগ করেননি কখনও। 'নিষ্ঠার সঙ্গে আধার বা আধেয় হবার দুর্মর স্পৃহা না থাকলে' শিল্পীর আয়ুষ্কালও যে সীমিত হবে এধারণা তাঁর ছিল। নাটকের grammer তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বিজন ভট্টাচার্য নিজেই জানালেন, "আমি স্থির করেছিলাম নাটকে আমরা পার্টির কথা বলব না। দেশের দশের কথা বলব। আমাদের প্রস্তুতি ছিল একটা হিউম্যানিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে।" বস্তুত এই 'নবান্ন' নাটকের হাত ধরেই পেশাদারি থিয়েটারের ভিত ভেঙে গণজীবনে আসে নব চেতনা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নতুন জীবনবোধে উদ্দীপিত করে তোলে মানুষকে। গণনাট্য সংঘের অন্তর্গত নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, খাদ্য সংকট, মহামারী, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও ব্যর্থতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা, তেভাগার লড়াই, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রূপরেখা, দেশত্যাগের বেদনা ও যন্ত্রণা এবং সর্বোপরি নতুনভাবে ও নতুন প্রত্যয়ে বাঁচার জন্য জীবন সংগ্রাম। content এর গতিই তাঁর নাটকের form নির্মাণ করেছে। সমাজ, সভ্যতা, তার প্রতি দায়বদ্ধতা শিল্পীকে যে কোনো ধরনের রচনায় প্রণোদিত করতে পারে, বিজন ভট্টাচার্য তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। The Crisis of the Artist নামক একটি ভাষণে (জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে) তিনি বলেছিলেন, "The crisis of the artist today is the crisis of the individual isolated from society....when the aritst fails to acheieve this interaction with society, he can only flounder in the hallucination of his egotism....My whole responds to the social reality; and even as I try to liberate myself, I try to liberate my art." আর সেই বিশিষ্ট আর্টের গুণেই গণনাট্য আন্দোলনের শরিক বিজনের শিল্প সার্থকতা।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১. বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত : ড. মন্দিরা রায় (প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১০)
২. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ২০১৩, বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ
৩. নবান্ন : বিজন ভট্টাচার্য, প্রমা প্রকাশনীর ভূমিকা
৪. বিজন ভট্টাচার্য : বাংলা রঙ্গমঞ্চের সাংস্কৃতিক রেনেশাঁ—অজিত বসু (এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. ১৪২০)
৫. মনচাষা : বিশিষ্ট বিজন সংখ্যা, ২০০৫।